Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামরুল হাসান বেগ
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.9
Pages	161-182
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

জামরুল হাসান বেগ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান। অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর উপন্যাস শুধু অস্তিত্ববাদের সূত্র-নির্ভর নয়, বরং এর অনেক উপাদানই তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত।

লালসালু (১৯৪৮) তাঁর প্রধান উপন্যাস। বাংলার গ্রামীণ মানুষের সমাজ ও জীবন এবং তাদের বিশ্বাস ও সংস্কার এর উপজীব্য বিষয়। লেখকের শৈশব- কৈশোরের গ্রামীণ অভিজ্ঞতায় রচিত লালসালু হয়ে উঠেছে বাংলার গ্রামের সর্বজনীন চিত্র।

গ্রামে ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের উপর যে প্রতারণা ও শোষণ চলে, লালসালু তারই চিত্র। তথাকথিত পীর ও মোড়লদের স্বরূপে উন্মোচন করেছেন লেখক। নারীর উপর অত্যাচারের চিত্রও উপন্যাসে জীবন্ত। চরিত্রচিত্রনে ঔপন্যাসিকের সচেতনতা সুস্পষ্ট।

লালসালু প্রথাগত রচনাঙ্গিকে সংগঠিত নয়। বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে একজন চিত্রশিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায়। *লালসালু* উপন্যাস পাঠকের মনে বঞ্চিত ও শোষিত মহব্বতনগরবাসীর প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করে।

প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২ - ১৯৭১) বর্তমানে শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতিমান। মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি; কিন্তু তাঁর এই স্বল্প সংখ্যক রচনার বিষয়বস্তু আর রূপগত উৎকর্ষ ও অভিনবত্বই তাঁর অসাধারণ খ্যাতির মূল কারণ বলে সমালোচকদের অভিমত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ-খ্যাতি প্রাপ্তি হঠাৎ করে হয়নি। তবে একথা বলা যায় যে আমাদের দেশে আশির দশকের আগে পর্যন্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফরাসি সাহিত্যিক-দার্শনিক জ্যাঁ-পল-সার্তের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা এবং তাঁর দর্শন বিশ্লেষণের যে সূত্রপাত এদেশে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিত্ববাদী লেখক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে আসছেন। পরবর্তীকালে স্বল্প সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর রচনা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। তবে তার বেশির ভাগই পুরাতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এবং অনেকাংশেই একদেশদর্শী। বিশেষ করে তাঁর প্রথম উপন্যাস, যা অনেক সমালোচকের মতেই 'নতুন দিক নির্দেশনা সংবলিত প্রতিবাদী চরিত্র অকুতোভয় জমিলার সাফল্যের কাহিনী' এবং আরো একধাপ এগিয়ে 'অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট মজিদের জীবন সংগ্রাম'-এ ধরনের মন্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিষয়ের দিক থেকে প্রায় একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের কাহিনী সংবলিত সমসাময়িক রচনার মতো ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাসের পটভূমিও একই ধরনের। তাঁর কৃতিত্ব শুধু উপস্থাপনগত অভিনবত্বে এবং সমাজ ও জীবনের গভীরে প্রবেশ করার যোগ্যতায়; অন্য কিছুতে নয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম উপন্যাস এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার-ধর্মভীতিতে নিমজ্জিত গ্রামীণ সমাজ ও মানুষের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন। নিখুঁত চিত্রাঙ্কন এই কারণে যে গ্রামীণ সমাজ ও জীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। পিতার কর্মস্থল পরিবর্তন সূত্রে তাঁরও চেনা-পরিবেশ ঠিকানা খুঁজেছে পিতার নতুন কর্মস্থলের অচেনা পরিবেশে। ফলে দীর্ঘ-স্থায়িত্ব লাভ করেনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিচিত বন্ধু-সহপাঠী স্বজনের সান্নিধ্য; বিশেষ করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নকালীন অবস্থায়। এ সময় তিনি পিতার সঙ্গে 'মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, ঢাকা, কুড়িগ্রাম, চিনসুরা, হুগলী, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় পড়াশুনা করেন [সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৮১ : ২৫]।

ছাত্রজীবনে, বিশেষ করে বাল্য কৈশোরে এ-ভাবে ক্রমাগত স্কুল পরিবর্তন ও সে-সব এলাকায় বসবাস ওয়ালীউল্লাহ্র অভিজ্ঞতালোককে ব্যাপক, বিস্তৃত, প্রসারিত ও

> বৈচিত্র্যমণ্ডিত করা ছাড়াও তাঁর মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রে সঞ্চার করে নিগূঢ় ও দূরসঞ্চারী প্রতিক্রিয়া [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৮ : ১]।

এ কারণেই গ্রামীণ সমাজ-জীবন সম্পর্কে জীবনের প্রথম পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী জীবনের 'সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অভিব্যঞ্জনা'র সমন্বয়ে সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন তিনি। এই অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই তিনি প্রবেশ করেছেন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার পীড়িত, অন্ধ-অযৌক্তিক ধর্মানুরাগী গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ের গভীরে ; যারা মোড়ল মোল্লাশ্রেণী শাসিত সমাজের চেতনাহীন আজ্ঞাবাহী। এক কথায় বলা যায়, সমাজ জীবনের অসঙ্গতির যথার্থ চিত্র উন্মোচনে সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাসের পটভূমি 'মহব্বতনগর' গ্রাম যেন ভণ্ডামীর মুখোশধারী মোল্লাশ্রেণী শাসিত এবং আয়ত্তকৃত সমগ্র গ্রাম-বাংলার ধর্মভীরু, কুসংস্কার নিমজ্জিত 'গ্রামীণ সমাজ।'

দুই

ধর্মের নামে অধর্ম, অনাচার আর ভণ্ডামী; মানুষের অসহায়ত্ব, অস্তিত্বরক্ষার অভীপ্সা ও সংগ্রাম; মানুষের অন্তর্বাস্তবিক বিস্ময় ও রহস্য অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রসঙ্গের সার্থক উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর রচনার উপকরণ এদেশীয়; এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমাজ-মানুষের জীবন থেকে নেয়া। জীবনের নানান সমস্যা, চাহিদা ও অপূর্ণতার বেদনাভিত্তিক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমকালে এ ধরনের সমস্যা ভিত্তিক আরো অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। যেগুলো নিতান্তই গ্রামীণ সমস্যার বাহ্যিক রূপায়ণ মাত্র। গভীরে প্রবেশ করার ততটুকু সক্রিয়তা বা অভিজ্ঞতা রচয়িতাদের রচনার মধ্যে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে কিছুটা ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা

> ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল বাবার সঙ্গে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে ; মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, হুগলীর মত অঞ্চলের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ফলে সৌখিন সাহিত্যকর্মীর মত গ্রাম্য পরিবেশ ও জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শেকড়বিহীন উপরাঞ্চলীয় নয়। একটা বয়সে গ্রামের প্রকৃতি ও গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় সংযোগ [সৌদা আখতার ১৯৮৬]।

যার পরিচয় তাঁর *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাস। এমনকি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)-র পটভূমিও এদেশীয়।

কল্লোল যুগে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যে মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তাতে সবকিছুতে না-বোধক চিন্তা-চেতনা সুস্পষ্ট; সবকিছুতে অবিশ্বাস, হতাশা, পরাভব, যৌনপ্রবৃত্তি, বিকারগ্রস্ততার প্রকাশ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস রচনার শুরুতেও কল্লোল যুগের সেই প্রবণতা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু তিনি নিজেকে এ গণ্ডী থেকে অনেকটা মুক্ত করে চালিত করেন নতুনতর ধারাপথে। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ গ্রামীণ মানুষের জীবনকে নিয়ে আসেন তাঁর রচনায় বাস্তব সচেতনায়; স্বচ্ছতায়। মধ্যবিত্তের *রোম্যান্টিক* কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বা আবেগে নয়। আসলে 'তাঁর সামনে ছিল এদেশের কুংসংস্কার-লাঞ্ছিত ভীরু গ্রাম্য-জীবন। তাঁর উপন্যাস, নাটক এবং ছোটগল্পের কোথাও গ্রাম্য-চৈতন্য তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে কৃত্রিম বা অনুজ্জ্বল নয়। [সৌদা আখতার ১৯৮৬]। তবে নিতান্ত গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক হলেও পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশ এবং বিশ্বানুভূতির সূত্র ধরে তাঁর মানসিকতায় কিছুটা হলেও যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেই ভিন্নতার রেখাপথেই তাঁর উপন্যাসও কোনো কোনো সূত্রে প্রবেশ করেছে ভিন্নতর ক্ষেত্রে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম উপন্যাস *লালসালুর* কাহিনী নির্বাচনেই অনেকটা দুঃসাহসী। সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস থেকে একটু বেশী প্রাগ্রসর। 'ইসলাম ধর্মের যে ভাবাদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে *লালসালুর* কাহিনীর মধ্যবিন্দু সেই ভাবাদর্শকে ব্যঙ্গ করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মোল্লাশ্রেণীর একাংশের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। [সৌদা আখতার ১৯৮৬]। যে যা-ই বলুক, জোর দিয়ে বলা যায় ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাশ্রেণীর ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচনই *লালসালুতে* ঔপন্যাসিকের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ *লালসালু* তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীর স্বার্থসিদ্ধির কথা। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু মানুষের ধর্মীয় ভীতিকে সম্বল করে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করা ও প্রভাবকে বিস্তৃত করার মানসিকতা সম্পন্ন মোল্লাশ্রেণীর অন্তঃসারশূন্য উপদেশ ও চারিত্রিক অসঙ্গতির উপস্থাপন। *লালসালুর* মহব্বতনগর গ্রাম যেমন বাংলার ধর্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বসবাসপূর্ণ যে কোনো গ্রামেরই চিত্র : তেমনি মজিদও সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসে জেঁকে বসা ভণ্ড মোল্লাশ্রেণীর প্রতিনিধি।

লালসালু উপন্যাসের শুরু আর্থ-সামাজিক কাঠামোর স্বরূপ এবং একটি ব্যক্তি চরিত্রের বেড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষ মজিদ, যার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় গারো পাহাড়ের নির্জনতায় ; যে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তির কথা ভুলে গিয়ে, শুধু বেঁচে থাকার নয়, নিজের আকাশচুম্বী প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে। তার ধারণা, এ সমাজ-জীবন ব্যবস্থায় উৎপাদিত সম্পদে বেঁচে থাকা কষ্টকর। তাই বেঁচে থাকার তাগিদেই নির্ধারিত সমাজ কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মজিদ শুধুমাত্র বাঁচার

জন্যেই সংগ্রাম করে কিংবা কর্মসংস্থানে আত্মীয়-স্বজন-পরিজন ছেড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে চলে যায় গারো পাহাড়ের সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনে- উপন্যাসে এ ব্যাপারটি ততটা সুস্পষ্ট নয়। স্পষ্ট নয়, বাঁচা মরার প্রশ্ন কিংবা অস্তিত্বরক্ষার ব্যাপারটি। আসলে মজিদের যে সমস্যা তা নিঃসঙ্গতাজনিত :

> আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখে মুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা ... দূরে জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কৃচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে– মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হালকা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণ্‌টা চক্‌চক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৫৮ : ৫]।

আর নিতান্ত বেঁচে থাকার সংকটে মানুষ নিরেট সত্য প্রকাশে দ্বিধা করে না। মজিদ-ই বা ব্যতিক্রমী হবে কেন! আমরা শুনি, মজিদ শিকারীর প্রশ্নের উত্তরে বেঁচে থাকার কথা নয়, ধর্মীয় জ্ঞান-বিস্তারে নিজের অংশগ্রহণের কৃতিত্বই শুধু নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে :

> এ ধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই। দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫]।

জনসমক্ষে যা-ই বলুক অন্তরগত চিন্তায় মজিদের নিজের কাছেও অভাবের ব্যাপারটি অতটা প্রকট নয়, কেননা এ অভাব তার একার নয় ; বিস্তৃত অঞ্চলের সমগ্র মানুষের। এজন্যেই এ অভাব তাকে খুব একটা বিব্রত করে না। তবে মজিদের ধারণা যে নিঃসঙ্গ পরিবেশে জীবন-যাপন করেও সে নিজের ন্যায্য সম্পদ ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিজের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। তাই অধিকার সুদৃঢ় করার জন্যও নিজের অধিকারের দাবিতে সে হয়ে ওঠে অন্যরকম মানুষ। নেয় শঠতার আশ্রয়। শুধু বেঁচে থাকার ন্যূনতম জন্মগত অধিকার টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে মানুষ তার অস্তিত্ব বিপন্নের সর্বশেষ পর্যায়ে অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টায় হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, সংগ্রামী এবং বিবেক-বর্জিত। কিন্তু মজিদ এ অবস্থার উপযোগী নয়। আমরা এ উপন্যাসে দেখি, শুধু বেঁচে থাকা নয়; আকাশচুম্বী প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মজিদ আশ্রয় করে মহব্বতনগরের মনুষ্যত্ব বিবর্জিত মানুষের ভীতিকে। তবে একথা বোধ হয় বলা উচিত যে গারো পাহাড়ে নিঃসঙ্গ যে জীবন ব্যক্তি-মজিদের, তাতে শুধু বেঁচে

থাকার মতো আর্থিক অভাবগ্রস্ততার চিত্র ততটুকু প্রকট হয়ে ওঠেনি। তাই মহব্বতনগরে এসে ধর্মভীরু, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে ধর্ম-আফিমের নেশায় মোহগ্রস্ত করার প্রাক্কালে মজিদের যে ভাবনা-কল্পনা তা হীন স্বার্থসিদ্ধির স্বপক্ষে সাফাই গাওয়ার পথ প্রশস্ত করার চিন্তাজাত। 'সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় স্বচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮]। আসলে মজিদ অসচেতন নয়। মহব্বতনগরের অযৌক্তিক ও অন্ধ ধর্মানুরাগী মানুষের আবেগ অনুভূতি আর বিশ্বাসের ভূমিতে তার ভণ্ডামীপূর্ণ ধর্মের যে চাষাবাদ তা আশাতীত ফল প্রদানে সক্ষম হবে, এটা তার অজানা থাকার কথা নয়। মাজারের প্রতি এ গ্রামের মানুষের অন্তরের দুর্বলতা সে তো বুঝেছে। তবুও যদি এটাকে 'সাংঘাতিক' খেলা-ই মনে করে সে, বলা যায় মজিদ এ ধরনের সাংঘাতিক খেলায় না নেমে জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য পথে অগ্রসরের চেষ্টা করতে পারতো। শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয় ; সচ্ছলতার চিন্তায় তার এ কর্মতৎপরতা প্রশংসার কাজ নয় কোনোমতেই। তাছাড়া '... দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৪]। তাই দারিদ্র্যের অভিশাপ মজিদের একার উপরে নয়। তার চারপাশের সমস্ত মানুষই এ দারিদ্র্যের শিকার। তবু তারা তাদের যোগ্যতানুসারে সম্পদ উপার্জনে তৎপর। এবং যোগ্যতানুসারে যা অর্জন করে তাতেই সন্তুষ্ট বলা যায়। কিন্তু মজিদ এদের থেকে এখানেও ব্যতিক্রমী। তার যে শিক্ষা, তার মননে

> যে বিদ্যে লেখা তা কোন-এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দুরান্ত কোন এক অতীত কালের অরণ্যে আর্তনাদ করে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৪]।

কালের পরিবর্তনে এ বিদ্যায় বিদ্বান মজিদ যা পায় তা-ই যথেষ্ট বলা যায়। এরপরেও তার যে আকাঙ্ক্ষা তা নিজেকে অসৎপথে প্রতিষ্ঠার এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের দুর্দমনীয় ও অসংযমী ভাবনাজাত। কেননা দারিদ্র্য-পীড়িত অন্যান্য মানুষ যেখানে জীবিকা-সংস্থানে ব্যস্ত সৎপথে 'নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ীর চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজজিন। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৪]। সেখানে মজিদ সচেতনভাবেই বেছে নেয় অন্যায়, ভণ্ডামি, জালিয়াতির পথ। মজিদ যোগ্যতানুসারে

তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েই অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে এ পথ বেছে নিয়েছে–সমালোচকের এ ধরনের একদেশদর্শী মন্তব্য গ্রহণযোগ্যতা হারায় এই কারণে যে ধর্মীয় শিক্ষাব্যতীত বর্তমান সময়োপযোগী আর কোনো আধুনিক শিক্ষা নেই মজিদের, যার বদৌলতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আকাশচুম্বী কল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব।

মজিদের সম্বল মহব্বতনগরের মানুষের মনের যে ভীতি,– 'খোদাভীতি' এবং 'মাজারভীতি'। যা ধর্ম-উদাসীন এবং বহির্জগত সম্পর্কে অসচেতন মহব্বত-নগরের সরল বিশ্বাসী মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে। এ সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, সামন্ত-সমাজ-ব্যবস্থায় সবচেয়ে শক্তিমান ধর্ম এবং জমিজমা। ধর্ম আর জমির মতো শক্তিশালী টোপ আর নেই মানুষকে আয়ত্তে রাখার জন্যে। যেখানে ধর্মের নামে চলে অধর্মের লীলা এবং অনাচার। মজিদ এ সমাজ-ব্যবস্থায়-ই বেড়ে ওঠা মানুষ। উপন্যাসে মজিদের সম্বল 'ধর্ম'। আর গ্রামের মাথা খালেক ব্যাপারীর সম্বল 'জমিজমা'। তাই মজিদ ধর্মীয় আফিমের ঘোরে জোতদার খালেক ব্যাপারীকে হস্তগত করে ফেলে নিজের শক্তি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে। কেননা তাকে আয়ত্তে রাখতে পারলে নিজের অবস্থানগত ভিত্তি সহসা ভেঙে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আর যেখানে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত মানুষ এবং মানুষের বিশ্বাস, সেখানে ধর্মের কাছে সম্পদের পরাজয় নিশ্চিত। তাই খালেক ব্যাপারীও শেষ পর্যন্ত মজিদের কাছে পরাজয় মানে:

> গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না ; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে [সৈয়দ আকরম হাসেন ১৯৮৬ : ১২]।

মজিদের নির্দেশ সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। এই সুযোগে একক প্রভুত্বের কর্তৃত্ব নিয়ে মজিদ জেঁকে বসে মহব্বতনগরে। দু'জনের সমন্বিত ছকে বাঁধা পড়ে মহব্বতনগরের মানুষ। খালেক ব্যাপারীর শক্তির দাপট আর মজিদের ধর্ম-আফিমের নেশায় অশিক্ষিত, কুসংস্কারে নিমজ্জিত, ধর্মভীরু মানুষ মাথা ঠুকে মজিদের পায়ের কাছে। খালেক ব্যাপারীকে নিজের দলে টেনে আনার এই ব্যাপারটিকে আকস্মিক ভাবা যায় না, বরং তা মজিদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল–উপভৌগিক চিন্তাজাত।

মহব্বতনগরের মানুষ যে ভয়ের বৃত্তে আবদ্ধ, মজিদের প্রথমা স্ত্রী রহিমাও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সেও মজিদের সুচতুর কৌশলে বন্দি। তাই

অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য মজিদকে প্রতিনিয়ত শুধু বাইরেই নয়, ঘরেও নানান ছল-চাতুরী ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। বিভিন্ন মিথ্যা এবং কল্পিত প্রসঙ্গ উপস্থাপন এবং ধর্মীয় আবহ ঘেরা ফাঁকা বুলিতে সম্মোহিত করতে হয় ধর্মভীরু মানুষকে। এ ধরনের হীন স্বার্থসিদ্ধির বাসনা কখনোই একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। মজিদ প্রথম থেকেই নিজস্ব ধর্মব্যবসার প্রসার এবং টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে মিথ্যা ভণ্ডামী আর ধর্মবিরোধী কর্ম ও বক্তব্যে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের নিদাগ হৃদয়কে ধর্মের নামে মিথ্যের ছল-চাতুরীতে দখল করতে ব্যস্ত। নিজেদের সচ্ছলতার সুবাদে সরল মানুষের ধর্মীয় মোহগ্রস্ততা যদি কেটে যায় তবে মজিদের ব্যবসার ধ্বস অবশ্যম্ভাবী। একথা মজিদ এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না। সতর্ক মজিদ মানুষের সরল হৃদয়কে কৌশলে এবং ধর্মের ফাঁকা বুলির মারপ্যাঁচে পরিচালিত করে ভিন্ন পথে।

> মাঠ ভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুনাহগার [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ১২]।

মহব্বতনগরে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর মজিদ অন্যের শ্রমে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পদ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অপশক্তির প্রতীক। তবে প্রতিষ্ঠার পথ বাঁধাহীন নয়। মজিদ তাই তার বিরোধী শক্তি হিসেবে যাকে কল্পনা করে তার বিরুদ্ধে চরমতম শাস্তি প্রদানেও এতটুকু কার্পণ্য করে না। এ ব্যাপারে সে কঠোর এবং নির্মম। তাই গ্রামের অন্যদের থেকে আলাদা চরিত্রের অধিকারী, মজিদের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষীণতায় স্বাধীন তাহেরের বাপের সামান্য অপরাধ-সূত্রে তাকে প্রদান করে কঠোর শাস্তি। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাও তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে রেহাই পায় না। আওয়ালপুর আগত পীর হয় লাঞ্ছিত ; আর সমস্ত বিদ্রোহী চেতনা বিসর্জন দিয়ে মজিদের কথার মারপ্যাঁচে এবং ধর্মের নামে ব্যবসায়িক চিন্তাসম্পৃক্ত কৌশলে চুপসে যায় আক্কাস মিঞা। নিজস্ব অবস্থানের ভিত্ পাকাপোক্ত এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব দানের নিমিত্তে তার যে পরিকল্পনা তা কখনোই আকস্মিক নয়। তাই মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস মিঞার প্রস্তাবকে সে কৌশলগত প্রক্রিয়ায় অর্থহীন সাব্যস্ত করে নাকচ করে দেয়। প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে আক্কাসকে, যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত নয়: 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?' অন্ধ ধর্মানুরাগী মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরাতে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কি! মজিদও এ অস্ত্রে ঘায়েল করে সরল মানুষের ভীরু-চিন্তা। এ অস্ত্র তাকে ব্যবহার করতেই হবে। কেননা মজিদ নিশ্চিত জানে যে, গ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন এবং বিস্তারে মানুষের অশিক্ষা ও পুরানো চিন্তা দূরীভূত

হবে। আর শিক্ষার সংস্পর্শে মানুষের অজ্ঞতার পরাভবে উড়ে যাবে কুসংস্কার ; ফলে মাঠে মারা যাবে তার ব্যবসা। এজন্যেই তার এ কৌশল অবলম্বন। সর্বমানুষের কল্যাণে স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো না, হলো পাকা গম্বুজওয়ালা একটা মসজিদ ; যা মজিদের ব্যক্তিজীবনের কল্যাণকর ব্যবস্থা বিধানের অটল কেন্দ্র।

আসলে শুধু নিজের কল্যাণ চিন্তায় তার যে অকল্যাণকর সিদ্ধান্ত তা বহুমাত্রিক। হিংস্র সাপ মজিদ; সাপ যেমন- হিংস্র এবং একই সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত,– তেমনি। মজিদ যে 'সাংঘাতিক' খেলায় মেতে ওঠে তার পরিণাম যে খুব ভালো না-ও হতে পারে তাও সে জানে। সে আরো জানে, যে কোনো সময় তার এই অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক আড়ম্বরের ভিত্ ভেঙে পড়তে পারে। মনে মনে এ চিন্তা সর্বক্ষণ তাকে ভীত-তাড়িত করে ; নিঃসঙ্গ করে তোলে। আপন কর্মের মিথ্যা ভোজবাজীতে-মজিদ অন্তরে অন্তরে নিঃস্ব-রিক্ত :

> কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ নিঃসঙ্গতা কালের মত আদি অন্তহীন– যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৬৫]।

মনোগত ভাবনায় পৃথিবীর সবকিছুতে তার অবিশ্বাস। শুধু অবিশ্বাস নয়, এ অবিশ্বাসের সূত্রেই তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ভয়। এ ভয় তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবিশ্বাসের, বিদ্রোহের এবং তার অবস্থানের ভিত্ নড়বড়ে করে দেবার। নিজের অবস্থান রক্ষার জন্যে মজিদের যে কর্মতৎপরতা তা অন্যায় বলেই তার মনে এ ভয়-সংশয়। এ ভয় ধর্মগত ও সমাজগত। 'বেঁচে থাকার অপ্রতিরোধ্য অমোঘ জৈব তাড়নায় ধর্মকে পণ্য করে তার হৃদয়ে দহন ছিল। ভয় ও দ্বিধা ছিল। [সৌদা আখতার ১৯৮৬]।

> খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তার করুণা অপার সীমাহীন [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৯]।

নিজের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ একান্তভাবেই একজন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষের চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয়। জীবনের সমস্ত আবর্জনা মুছে ফেলে এখানেই সে হয়ে ওঠে একজন সম্পূর্ণ মানুষ। কেননা মানুষ যে কর্মই করুক তার ভালোমন্দ বোধ সম্পর্কে সে নিশ্চয়ই অবগত। কেউ সে বোধকে প্রাধান্য দেয়, কেউ

দেয় না। মজিদ এ সব বুঝলেও নিজেকে ফিরাতে পারে না এ পথ থেকে। এখানেই 'অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট চরিত্র' বলে মজিদের পক্ষে সমালোচকদের যে দাবি, তা বোধ হয় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। আসলে, একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে যা ভালো তা নির্বাচন 'অস্তিত্ববাদে'র লক্ষ্য হলেও শুধু নিজের অস্তিত্বরক্ষায় নয়; যদি তা হয় তবে তা উপভৌগিক চিন্তা। সমগ্র মানুষের অস্তিত্বরক্ষায় নিজের উপলব্ধিকে সকল মানুষের জন্যে কাজে লাগিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণই অস্তিত্ববাদের মূলকথা। মজিদ এ-দিক থেকে পিছিয়ে। একান্তভাবেই উপভৌগিক।[১]

নিজস্ব অবস্থান পাকাপোক্ত হওয়ার মজিদের আকাঙক্ষা জীবন উপভোগে সক্রিয়। এ আকাঙক্ষার শুরু এখানে নয়। বরাবরই তার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল, নীরবে। সাধনার পবিত্র শিখা তার মনের অসংযমী আকাঙক্ষাকে পুড়িয়ে দিতে পারে না। তার সাধনার শিখা অতোটা তেজোময় নয়। তাই তার মনোগত ভাবনায় বারে বারে মাথা তোলে 'সাপের লক্‌লকে জিহ্বা'। উপলব্ধিতে একটি কথাই বার বার ঘুরপাক খায় 'জীবনকে উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ–সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ২৯]।

আসলে, কল্লোল যুগের উন্মাদনা যে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে একেবারেই স্পর্শ করেনি তা নয়। মজিদের অসংযমী মনোভাব ও হাসুনির মাকে দেখে তার যে চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং আদিম প্রবৃত্তির জাগরণ, তা মাত্রাগত বিচারে খুব বেশী না হলেও *লিবিডো* চেতনার স্বরূপকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। হাসুনির মার 'উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ' মজিদের অন্তরে আদিম উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। এ ভাবনা তার অসংযমী হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। নিজের অবস্থান ও সম্পদ বৃদ্ধির মতো এও এক ধরনের নেশা। যে নেশায় সে তার পৃথিবীর পরিধি বাড়াতে চায় জৈবিক পরিতৃপ্তি লাভের মাধ্যমেও :

> সে-ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে- আলো ই তেমনি উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চক্‌চক করে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ২৯]।

মজিদ শুধু হাসুনির মাকে মনে মনে কামনা করেই ক্ষান্ত নয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা-সূত্রে একথা বোধ হয় বলা যায় যে ধর্মের ধ্বজাধারী মজিদের মতে পরনারীমুখ দর্শন গুনাহ্‌র কাজ হলেও সে নিজের বিচার সভায় নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে হাসুনির

মায়ের উপর হাসুনির পিতার অমানুষিক অত্যাচারের কথা। 'তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল নীল হইছে ক্যান [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৪৮ : ২৪]।

এ অনুপুঙ্খ বর্ণনা যে পরনারীতে মজিদের লোলুপতাজনিত চারিত্রিক ত্রুটির কথা–তা আমরা অনুমান করতে পারি নিঃসন্দেহে ; যে মজিদ আপন স্ত্রী রহীমার মনোগত ভাবনার তোয়াক্কা না করে হাসুনির মাকে শাড়ী কিনে দিতেও লজ্জাবোধ করে না। পরনারী আসক্তিতে সে 'লজ্জা' ভুলে যায়। পরস্ত্রী আমেনা বিবিকে দেখেও 'তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫৩]।

> পাল্কির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার (মজিদের) দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৪৮ : ৫১]।

কিন্তু *লিবিডো* চেতনার সূত্রে অচরিতার্থতার যে ইচ্ছে তা তার অবস্থানের ভিত্ সুদৃঢ় রাখার চিন্তার সঙ্গে যোগ হয়ে তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে; মনে ভালবাসা জাগায় না :

> আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো. সে পা-ই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা-দেখে স্নেহ মমতা উঠে না এসে. আসে বিষ। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫২]।

জৈবিক তাড়নাগত বিকার মজিদের মুখনিঃসৃত বক্তব্য. আচার-আচরণ ও কর্মতৎপরতায় অনেকটা স্পষ্ট। ধর্মের সাধনায় সিদ্ধি অর্জনের কথা নয় ; বরং এটা মজিদের ভণ্ডামীর সবিস্তার বহিঃপ্রকাশ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমেনার সন্তান ধারণ ক্ষমতা পরীক্ষাপূর্ব অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর মূল্যহীনতা, পরাধীনতা, শৃঙ্খলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজের হৃদয়হীন নীতি-শাসনে বন্দি আমেনা আপন অভিপ্রায় প্রকাশে অক্ষম। সমাজের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকে অস্বীকারে শক্তিহীন আমেনার সম্মতি তা-ই সমস্ত মানবিকতা পরিপন্থী প্রস্তাবেও—

কিন্তু গুটি গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোন মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজেই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বোতভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়াত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫১]।

সবচেয়ে বড় কথা যার ওপর আমেনা বিবির ভরসা সে-ই খালেক ব্যাপারী পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রতিনিধি মজিদের ভণ্ডামীপূর্ণ ধর্মের অভাবনীয় মাদকতার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য, শক্তি, স্নেহ-ভালবাসা ও বোধ বিসর্জন দিয়ে মাথা নোয়ায়। বিষহীন সাপের মতো মাথা ঠুকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো গ্রহণ করে মজিদ কর্তৃক উচ্চারিত শাস্তির ফতোয়া। এবং তা কার্যকর করতে খুব বেশী সময়ও নেয় না। এ-সূত্রে, সমাজ আর সমাজপতির মিথ্যা প্রতিহিংসার আগুনে পোড়ে ছাই হয়ে যায় এতদিনের দাম্পত্য বন্ধন:

... এর তিনদিন পর যে আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো সে-ই কামনা বাসনা বিসর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫৮]।[২]

তিন

আলোচনা সূত্রে বলা যায়, চরিত্রসৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সচেতন ; বিশেষ করে মজিদ চরিত্রের সামগ্রিকতা বিধানে। শুধু মনোগত ভাবনা বিশ্লেষণ নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশের বাহ্যিক আবহও চরিত্রে সম্পৃক্ত। তাই মজিদের বর্ণনা কিংবা বক্তব্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারে সে হয়ে উঠেছে অকৃত্রিম। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র মাপের। নিজস্ব ভক্তি-বিশ্বাসে অনেকটাই আলাদা। উপন্যাসের মূল চরিত্র মজিদ, রহীমা, জমিলা। এসব চরিত্রের সম্পূর্ণতা প্রদানের সহায়ক হিসেবে এসেছে খালেক ব্যাপারী, তাহেরের বাপ, হাসুনির মা, আমেনা বিবি, আক্কাস মিঞা, ধলা মিঞা প্রমুখ। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারীর ওপর মজিদের প্রভুত্ব মজিদের শক্তি ও ক্ষমতাকে স্পষ্ট করে তুলে ; হাসুনির মাকে নিয়ে তার (মজিদের) যৌনকামনা মানবিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। স্বার্থসিদ্ধি ও নিজস্ব অবস্থান অটল রাখার

প্রশ্নে অন্যের অন্যায় সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে খালেক ব্যাপারীর প্রচেষ্টা আমাদের গ্রামীণ সমাজ জীবনের তথাকথিত মাতব্বর শ্রেণীর গতানুগতিক চরিত্রকেই উজ্জ্বল করে তোলে। পক্ষান্তরে তাহেরের বাপ এবং মোদাব্বের মিঞার শহরে পড়ুয়া ছেলে আক্কাস মিঞা তাদের চারিত্রিক ব্যতিক্রমী বক্তব্যে অনেকটাই দুঃসাহসী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ উপন্যাসে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের কিছুটা আভাস আছে একথা স্বীকার্য ; তাহেরের বাপের মাধ্যমে যার সূত্রপাত। মজিদের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে মহব্বতনগরের মাত্র একজন মানুষই অবিশ্বাসী, সে তাহেরের বাপ। সে অনেকটা যুক্তিবাদী, অনেকটা মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন, একগুঁয়ে ; বাইরের জগতের সঙ্গে (মহব্বতনগরের বাইরে) তার কিছুটা জানাশোনা মামলা পরিচালনা-সূত্রে। তার পারিবারিক বিবাদ-কলহের কথা পারিবারিক গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মজিদ সে কলহের কারণ সম্পর্কে গোপন সূত্রে অবগত । এ-সূত্র সম্পূর্ণ গোপন রেখে সে ব্যস্ত নিজস্ব উপলব্ধি, অন্তর আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্য প্রচারে। 'অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে (তাহেরের বাপ) বিশ্বাস করে না [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ১৯]। মজিদের ধর্মীয় উপদেশ, ধর্মকথার বয়ান কিংবা লালসালুতে ঢাকা 'মাছের পিটের মতো মাজার' তার মনে ভয় তো দূরের কথা, সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে না। মোদাচ্ছের পীরের মাজার তার দৃষ্টিতে শব্দহীন, চিরনীরব মোহজাল যেন ; যা সরলপ্রাণ মানুষের হৃদয়কে ধর্মীয় আবেগমাখা কুয়াশায় মোহগ্রস্ত করে। মজিদের ভণ্ডামী সম্পর্কে সে সচেতন ; অন্যান্যদের থেকে এখানেই তাহেরের বাপের স্বাতন্ত্র্য। ধর্মীয় ফাঁকা বুলির বিরুদ্ধে এখানেই কিছুটা বিদ্রোহ ; যদিও তা অতটা প্রচণ্ড কিংবা প্রত্যক্ষ নয়। একথাও সত্য যে এ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সে বেশী দূর অগ্রসরও হতে পারে না। 'কারণ তার মেরুদণ্ড নেই'। তবু তার হৃদয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ নিজের সামাজিক অবস্থার কথা ভেবে অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার যন্ত্রণায় :

> আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে দলে ভারী কালো মেঘে লড়াই লাগে, মহব্বত-নগরের সর্ব্বোচ তালগাছটি বন্দী পাখীর মতো আছড়াতে থাকে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ২৫]।

সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তির অভাব-চিন্তা এক সময় তাকে নিঃস্তব্ধ করে দেয়। সে প্রতিবাদ জানাবে, কিন্তু অনড়-অটল ভিত্তি কোথায় তার? তাই যে 'লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়েছিল তারও চোখ এখন নরম। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ২৩]।

অন্যদিকে, মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা! জমিলা,-- রহীমা নয় ; যে রহীমা খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায় [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ১০]। মজিদের অতৃপ্ত মনের গোপন ইচ্ছে পূরণার্থে জমিলার আগমন ; কিন্তু সে নিতান্তই মজিদের হাতের পুতুল নয়। নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে চায়। সে ঘোমটা খুলে একেবারে বাইরে সবার সামনে যায়, সমস্ত বারণ উপেক্ষা করে সশব্দে হাসে, নামাজ পড়তে গিয়ে জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে, এমনকি মজিদের বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করার সর্বশেষ প্রচেষ্টায় মজিদের মুখে থু-থু ছিটিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়। তার এসব আচরণ একান্তভাবেই ছেলেমানুষী। সে কখনোই বিদ্রোহী নয় ; অবুঝ। অবুঝ বালিকার মতো তার আচার-আচরণ। মজিদের ভণ্ডামী যে তাকে বিতৃষ্ণ বা সাহসী করে তোলে তা নয়। সে তার শিশুসুলভ মানসিকতায়ই সব কাজ করে যায়। তাই মজিদের ক্রমাগত উপদেশে সে চটে না। তার এই নির্লিপ্ততায় মজিদ ভীত হয়ে পড়ে। কেননা, নিজের অন্তঃসারশূন্য হৃদয় সম্পর্কে মজিদ সচেতন। এই সচেতনতায় সে সর্বদা শঙ্কিত। তার প্রভুত্ব জমিলার কাছে যেন অর্থহীন। কেননা... 'এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮২]। রহীমা-ই বা মজিদের থেকে ব্যতিক্রম কিসে! আচরণগত বৈশিষ্ট্যে নিজের সঙ্গে যখন জমিলাকে মিলিয়ে নিতে পারে না, তখনই তার ভয়। এ ভয় প্রভুভক্ত স্বামীর কাছ থেকে শেখা। এজন্যে স্বামীর প্রভুত্বের কাছে জমিলার আচরণ তার কাছে যেন কেমন বেমানান মনে হয়, ভয়ও হয় :

> মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মত মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজার পাকের দোয়ায় যে সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধুলিসাৎ হয়ে যাবে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৭৯]।

তার ধারণা, জমিলা একরত্তি মেয়ে হলেও একটা বিশাল ঝড়ের পূর্বাভাস বুকে ধারণ করছে, যার প্রচণ্ডতা মুহূর্তে উন্মত্ত তাণ্ডবে সমস্ত সংসার, সমস্ত বাসনা-কল্পনাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যাবে। জমিলা সম্পর্কে মজিদ ও রহীমার এ ভাবনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিজেদের অন্তরগত দুর্বলতায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা শঙ্কার প্রকাশ। কেননা, মজিদ তো জানে মাজার সম্পর্কে তার বানোয়াট গল্প মনে মনে জমিলাকে ভীত-বিহ্বল করে তোলে। 'যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮১]।

আর এই অজানা আশঙ্কা ও ভীতিতে সে মজিদের কথামতো রাতে নামাজ পড়তে ভুল করে না। তবে নামাজ পড়তে গিয়ে জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়া অবুঝ জমিলাকে হ্যাঁচকা টানে জাগিয়ে তুললে সে কাঁপে। 'ভয়ে নয় ক্রোধে'। এ ক্রোধ অবশ্যই বিদ্রোহের সূত্রে নয়। কারণ মুক্তির প্রচেষ্টায় মজিদের মুখে থু-থু ছিটিয়ে দেওয়ায় রহীমার যে 'আর্তনাদ', তাতে সহসাই চুপসে যায় জমিলা। 'তার (রহীমার) আর্তনাদে কী ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মনে-প্রাণে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৪]।

ক্রোধে কাঁপতে থাকা জামিলার হঠাৎ এ কী পরিবর্তন! এ পরিবর্তন অন্যায় চিন্তায়, একটা অজানা আশঙ্কায়; এবং অজানা ভয়ে। যা তার এতক্ষণ চেপে রাখা ক্রোধকে নিমেষেই নিঃশেষ করে দেয়। মুহূর্তেই সে হয়ে যায় অন্ধস্বামীভক্ত; রহীমার শ্রেণীভূক্ত। মজিদের বজ্রমুষ্টি থেকে মুক্তির আশায় সে আর সামান্যতম চেষ্টা করে না। বরং নিস্তেজ হয়ে দেহ এলিয়ে দেয় মজিদের দুই বাহুতে। যেন পতিগতপ্রাণা নারী; শেষ নিরাপদ আশ্রয় স্বামীর বাহুবন্ধনে। মজিদের মন তবু ভরে ওঠে অজানা আশঙ্কায়। রহীমার মতো তার মনেও ভয় 'মাজার পাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে সংসার ধুলিসাৎ হয়ে' যায় যদি! তাই শেষ প্রচেষ্টায় নিজের অবস্থানগত ভিত্তি অটুট রাখার নিমিত্তে 'একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৫]। বেঁধে ফেলে। ভয়-বিহ্বল জমিলার মনে এতক্ষণ ধরে জমা ভয় হঠাৎ তাকে জমাট বরফের মতো স্থির-নিশ্চুপ-উত্তাপহীন করে দেয়। মুহূর্তে ডুবে যায় স্তব্ধতায়। 'অধিক শোকে পাথরে'র মতো। কিছুই যেন বলার নেই। মুক্ত হওয়ার চেষ্টাও নেই। নেই ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠের আর্তচীৎকার। তার এই নিষ্ক্রিয়তাকে এবং ভীতিকে বিদ্রোহী চেতনা বলবো কী করে? আর একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মাজারে যেতে জমিলার যে অনীহা তা মজিদের ভণ্ডামীর ফলস্বরূপ তার মনে জন্মানো ঘৃণাবোধ থেকে নয়। কেননা, মজিদের প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই, ঘৃণা নেই। উপন্যাসের কোথাও তার কর্মাচরণে এ-ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আসলে মাজারে যেতে সে ভয় পায় তার অন্তরগত শিশুসুলভ ভয়জনিত কারণে। তবে শিশুসুলভ, ধর্মীয় কিংবা মজিদ-ভীতির কারণেই হোক এটা সত্য যে, মনে মনে সে সীমাহীন ভীতিতে নিমজ্জিত। সত্যিই 'একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৫ দেয়। এ জন্যেই জমিলা বিদ্রোহী চরিত্র নয়।

মজিদ বা রহীমার আদেশ, উপদেশ কিংবা পীড়নে জমিলার যে নির্বাক-নিশ্চুপ অনীহা, তাচ্ছিল্য বা এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা, তা অবশ্যই অবুঝ বালিকার অপরিপক্ক মনের খেয়ালজাত। তাকে কোনো মতেই প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মনোভাবসম্পন্ন

মনের অধিকারী হিসেবে কল্পনা করা যায় না। তবে বলা যায়, জমিলার মধ্যে অসচেতনভাবে কখনো কখনো বিদ্রোহের আগুন ঝলকে উঠেছে; স্থায়িত্ব লাভ করেনি। আপন জগতে তার পরিভ্রমণ নিজস্ব খেয়াল প্রসূত। তার বিদ্রোহ সত্যিকার অর্থে সচেতন মানসিকতাজাত হলে মজিদের আদেশ, উপদেশ কিংবা রহীমার আর্তনাদ তাকে কিছুতেই স্তব্ধ করে দিতে পারতো না। তাই আমরা সমালোচকদের একথা মেনে নিতে পারি না যে তাহেরের বাপের মাধ্যমে এ-উপন্যাসে বিদ্রোহের যে সূত্রপাত, শেষে জমিলাতে এস তার বিস্ফোরণ। বিদ্রোহী চরিত্র হিসেবে জমিলার দাবী কতটুকু তা তো আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি। আর তাহেরের বাপের তার মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন তা ক্ষণস্থায়ী কিংবা পরোক্ষ হলেও সচেতনভাবে সৃষ্ট। এজন্যেই বিদ্রোহ-চেতনায় তাহেরের বাপের যতটুকু, কৃতিত্ব, জমিলা তার ধারে কাছেও যেতে পারে না।

ঔপন্যাসিক *লালসালুর* সমাপ্তিতে যে মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন তাতে দেখা যায় অচৈতন্য জমিলার 'মেহেদি দেয়া একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৯]। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে মজিদ যখন অচেতন জমিলাকে মাজারের গায়ে পা লাগা অবস্থায় দেখে, তখন 'পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না।' [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৯]। কেননা এ পা অচেতন, অবুঝ জমিলার পা। বিদ্রোহীর পা নয়। ঔপন্যাসিক এ দৃশ্যে জমিলাকে জাগরিত অবস্থায় উপস্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। হয়তো সচেতনভাবেই তাঁর এই কৌশল অবলম্বন। কেননা তাঁর *লালসালুর* রচনাকাল ধর্মভিত্তিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি লগ্নে। তাই ধর্মভীরু মানুষের মনে 'ধর্মের নামে এই যে ভণ্ডামী তার বিরুদ্ধে' সচেতনতা সৃষ্টির পরিবর্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এরূপ ধারণাবশতঃই সম্ভবত তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার আশার বীজ বপন করতে চেয়েছেন এবং করেছেনও। কিন্তু অচৈতন্য জমিলার উপস্থাপনে *লালসালুতে* উপ্ত সে অঙ্কুরোদ্‌গমহীন বীজ সুপ্ত অবস্থায়ই রয়ে গেছে। বিকশিত হতে পারেনি। ফলে *লালসালুর* পক্ষে সম্ভব হয়নি ধর্মের নামে অধর্মের বার্তাবহ মোল্লাশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট প্রথাগত নীতি-অনুশাসনের সীমানা পেরিয়ে সৌরভ ছড়ানো। সর্বোপরি, অপশক্তির প্রতীক মজিদ শেষ পর্যন্তও আপন বিশ্বাসে ও কর্মতৎপরতায় অটল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিনষ্ট সমস্ত শস্য। এই বিপর্যয় মজিদের মনে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। অবশ্য মজিদের কাছ থেকে যে-কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর আশা করাও যেন আমাদের জন্যে অর্থহীন আশা। কেননা, তার কিসের ভয়? 'বিশ্বাসের পাথরে খোদাই' তার এবং অন্ধ-ধর্মানুরাগী সমাজ-মানসের চোখ। সুতরাং, অব্যাহত তার চলার গতি সুমুখের পানে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বর্তমান সমস্যাকে, মানুষের ভাবনা-চিন্তাকে নিরাশার অন্ধকারে সীমায়িত রাখতে চাননি। তাঁর মধ্যে সব সময় কাজ করেছে আলোকিত ভবিষ্যতে উত্তরণ-চিন্তা। আর বর্তমান নৈরাশ্য-ব্যর্থতা, সমস্যা, দুঃখ-বেদনা এবং অনির্দেশ ভবিষ্যৎ থেকে একটা কল্যাণকর ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা প্রদানকে তিনি একজন লেখকের সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন এবং এ ব্যাপারে উতরে যাওয়াই ছিল তাঁর কাছে লেখক হিসেবে সার্থকতার প্রথম দাবি। তিনি নিজে এ পথে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। সমালোচকদের মতে, ধর্মের লেবাসে ভণ্ড-ধার্মিক শ্রেণীর শোষণ এবং তা থেকে জাগ্রত মনের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও সাধারণ মানুষের মানস মুক্তি এবং শৃঙ্খলিত সমাজের উদ্ধার *লালসালু* উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায় অভিব্যক্ত। লেখক চেয়েছেন ভীরুতা, অজ্ঞতা আর ধর্মের নামে মিথ্যাচারের অন্ধকার থেকে ক্ষত-বিক্ষত বিবেককে সচেতনতার উজ্জ্বলতায় পৌঁছে দিতে, আলোকিত কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে। আমার ধারণা, এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যে বিদ্রোহী চরিত্রের সৃষ্টি, তা সার্থক নয়। তা বিদ্রোহী চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি এই কারণে যে, সে অবুঝ মনের অসচেতন সিদ্ধান্তের মধ্যে নিয়ত সঞ্চরণশীল। সবচেয়ে বড় কথা, এ উপন্যাসে মজিদের উপস্থিতি যেমন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; কিন্তু যাকে নিয়ে প্রথাবদ্ধতার অটল প্রাচীরে আঘাত হানবেন বলে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য, সেই জমিলা তা নয়। মজিদ যেমন জীবনের ভালো-মন্দ মিলিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ, জমিলার বেলায় সে সুযোগ মিলেনি। স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত জমিলার বিকাশ ততটা ঘটেনি উপন্যাসে, লেখকের বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশে এবং বিজয়ী ভাবনা-সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার উপস্থিতি যতটা প্রয়োজন ছিল। অবশ্য ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম সচেতনতায় এই স্বল্পায়তনের বর্ণনাতেই জমিলা আরো ভাস্বর হতে পারতো। যেমন পেরেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) অভয়া, অন্নদা দিদি কিংবা কমল লতা। তাদের সামাজিক অবস্থানও জমিলার চেয়ে বড় নয়। তবু তারা তাদের কর্মাচরণে এক-বারেই পাঠকের মনে চিরদিনের জন্যে ঠাঁই করে নেয় অতি সহজেই, যা জমিলার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

লালসালু উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলো বিশেষ করে মজিদ চরিত্র বিশ্লেষণে সমালোচকগণ অনেক ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে 'অস্তিত্ববাদী' ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর। আমার ধারণা, সমালোচকদের উপরিউক্ত মন্তব্য যদি গ্রহণ করতেই হয়, তবে বাংলা সাহিত্যে অনেক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকে-ই বা এ অভিধা থেকে বঞ্চিত করবো কোন্ অধিকারে? আগেই উল্লেখ করেছি মজিদের যে সংগ্রাম তা অস্তিত্ববাদের সংগ্রাম কী করে? গারো পাহাড়ে মজিদকে যে ভাবে দেখেছি তাতে তার 'অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পথে' বা সে 'বিপন্ন অস্তিত্ব' একথা সত্য নয়। মজিদ অস্তিত্বলিপ্সু নয়; তার লিপ্সা প্রভাব-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠা লাভে।

—১২

মহব্বতনগরে তার আগমন নিছক এই উদ্দেশ্য চরিতার্থতায়। স্মর্তব্য, অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক শর্ত হলো 'স্বাধীনতা'। এ স্বাধীনতা নির্বাচনের স্বাধীনতা। শুধু নির্বাচন নয়; সামগ্রিক কল্যাণকর কিছু নির্বাচন এবং সবার মঙ্গলার্থে নির্বাচিত বিষয়ের বাস্তবায়ন। মজিদের মধ্যে প্রথমটি আছে; শেষের দু'টি নেই। সর্বোপরি তার যে নির্বাচন তাও ব্যক্তির কল্যাণ চিন্তাজাত; সামগ্রিক নয় কোনো বিচারেই।[৩]

আসলে, মজিদের যে সংগ্রাম কিংবা জমিলার যে আচরণ তা অত্যন্ত সংকীর্ণ বিষয় সমন্বিত—অস্তিত্ববাদের বিশালত্বের কাছে। তবু উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে এসব চরিত্র এবং চরিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে যদি অভিহিত করি, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫১) প্রমুখের উপন্যাসেও অনেকগুলো সংগ্রামশীল চরিত্রের সন্ধান মিলে যারা সংগ্রাম, সাহসিকতা এবং সচেতনতায় ও চাহিদায় মজিদ, তাহেরের বাপ কিংবা জমিলা থেকে অনেক এগিয়ে। অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাদের যে সংগ্রাম তা অবশ্যই আরো বেশি সমর্থন যোগ্য। এ বিচারে উপরিউক্ত ঔপন্যাসিকগণও 'অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক' একথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত।

অস্তিত্ববাদী লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই যে তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত, তা নয়। এ উপন্যাসে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ও সার্থকতা সমাজ ও মানব চরিত্রের পরিপূর্ণ উপস্থাপনায়। কেননা :

> এই-সমাজে তাঁর বিচরণ ছিল ছেলেবেলায়। সম্ভবত সেই স্মৃতি-চিত্র তাঁর চিত্তে প্রগাঢ় ছায়াপাত করে। তাই যৌবনে বিদগ্ধ সহকর্মীদের সাহচর্যে বাস করেও জীবন দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় তিনি গ্রাম্য অভাজনদের মনোভূমে পৌঁছেছেন শিকারীর অব্যর্থতায়। [সৌদা আখতার ১৯৮৬]।

আর নির্বাচিত বিষয়কে তিনি আপন মেধায়-মননে সমকালীন সমাজ মানুষের চিন্তা-বোধ ও বিশ্বাস থেকে অনেকটা প্রাগ্রসর পটভূমিতে স্থাপন করেছেন—সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও। এর পেছনে মূলত কাজ করেছে তাঁর সেই জীবনদর্শন, যাতে কখনো কুসংস্কার কিংবা অন্ধবিশ্বাসের স্পর্শ লাগেনি, বরং যে জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে অসহায়, নিপীড়িত, নির্যাতিত সহজ-সরল মানুষের বেদনার্তিতে। এককথায়, তাঁর জীবনদর্শন মানুষের মানবিক চেতনাকে সম্বল করেই।

চার

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাস প্রথাগত রচনাঙ্গিকে সংগঠিত নয়। *লালসালু* উপন্যাসে এরিস্টটলীয়-ভিক্টোরীয় আদি-মধ্য-অন্ত্য রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এ ব্যবহারেও তিনি এরিস্টটলীয়-ভিক্টোরীয় রীতির পূর্ণ-প্রয়োগ ঘটাননি। স্বাতন্ত্র্য আছে অনেকাংশে। তিনি নির্ভর করেননি আভ্যন্তর কার্যকারণ তত্ত্বের উপর; ঘটনা পারম্পর্যে আবেগ-মননের মাধ্যমে তিনি এতে যোগসূত্র দান করেছেন। ছোটবেলা থেকেই চিত্রশিল্পের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে যদিও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেননি চিত্রশিল্পের উপর, তথাপি এ নেশা থেকে নিজেকে কখনোই একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। আপন মনের খেয়ালে ছবি এঁকেছেন। দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আর প্যারিসে অবস্থানকালে সুযোগ লাভ করেন চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জনের। তাঁর এই চিত্রশিল্পীগত মানসিকতা কাজ করেছে উপন্যাস সংগঠন-এ। যাতে তিনি ছেঁড়া ছেঁড়া কাহিনীর উপস্থাপনে নির্মাণ করেছেন উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনা, বর্ণনার এক-আধটু আঁচড়ে এক একটি বিশাল ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন এবং এতে সার্থকতাও লাভ করেছেন। তাই তাঁর রচনায় বর্ণনাত্মক বিষয়ও অনেকাংশে হয়ে উঠেছে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, সংক্ষিপ্ত, প্রতীকধর্মী। উপন্যাসে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এ সূত্রেই। আর এ কারণেই সমসাময়িক অন্যান্যদের চেয়ে তাঁর রচনার শরীর অনেক বেশী আঁটসাট; দৃঢ়বদ্ধ, কতগুলো চিত্রের সমন্বয়ে যেন বিস্তৃত জীবনের বিশাল ক্যানভাস :

> ক. তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ খোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৩৪]।
> খ. রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ২৯]।

উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বিভাজনও প্রথাবদ্ধ নয়। বিভাজন *থিমেটিক*। বাংলা উপন্যাস ধারায় যা নবতর সংযোজন।

উপন্যাসে প্রথম পর্যায়ে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ পরিচর্যারীতির সাক্ষাৎ মিলে। কিন্তু পরক্ষণেই এর কারুকার্য বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে কয়েকটি চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণিত এ উপন্যাস : আর এ প্রেক্ষণবিন্দুর ভিন্নতা পরিবর্তন এনেছে বক্তব্যে। তাই মজিদ ও জমিলার বক্তব্যে বিস্তর ফারাক। *ইমপ্রেশনিস্ট* পরিচর্যারীতির ছাঁচে পরিপুষ্ট লেখকের বক্তব্য; কিন্তু এই বক্তব্য ব্যাপক বিস্তৃত নয়। এর তাৎপর্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের মেধা ও আবেগের উপর :

বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না উঠেছে। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত, টাট্কা–লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৫৫]।

টাট্কা রক্ত আমিনার। আমিনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাবনা ও মানবজীবনের ব্যর্থতা দেখেছে মজিদ ম্লান জ্যোৎস্নায়।

বিষয়ের অনুষঙ্গী গদ্য ব্যবহার করেছেন লেখক। তবে প্রাত্যহিক বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে চরিত্রের নিঃসঙ্গতা কিংবা মনোজগতের বর্ণনায় গদ্য সঙ্গীতধর্মী ও চিত্রধর্মী :

ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে অন্ধকার সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে। [সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৬ : ৮৪]।

পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গে সমন্বয় সৃষ্টিতে শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার সুস্পষ্ট। তাই মজিদ চরিত্র রূপায়ণে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার। ম্লান-জ্যোৎস্না, উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, রঙ, ঝরা পাতা, মাছের পিঠ, ঝড়, সাপ, তালগাছ প্রভৃতি প্রতীক এবং শাব্দিক *সিম্বল* 'ভয়'-এর ব্যবহার সমস্ত উপন্যাসে বার বার। ঔপন্যাসিক *সিম্বল*, গীতিধর্মিতা, চিত্রধর্মিতা, *ইমপ্রেশনিস্ট* পরিচর্যারীতিতে জীবন ও দৃষ্টির অবিকল চিত্রকে তুলে ধরেছেন। আর এসবের সমন্বয়েই উপন্যাসের প্রবহমানতা।

পাঁচ

ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কাহিনী ও চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছেন। সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন কাহিনী। নিজস্ব বিশ্বাস-দর্শন-বক্তব্য, পারিপার্শ্বিক দেশকাল সম্পর্কে সচেতনতা, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা তাঁকে পরিচালিত

করেছে একটি নির্দিষ্ট ধারায়। তাই তাঁর রচনায় অতি নাটকীয়তা কিংবা মানবজীবনের দুঃখ-বেদনার নিষ্ঠুরতা অযাচিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি কোনো পক্ষের সমর্থনেই কথা বলেননি; না মজিদের, না তাহেরের বাপের, না জমিলার পক্ষে। তবু আমাদের ঘৃণা এবং আমাদের করুণা মজিদ নামের সেই 'বজ্রকঠিন অথচ ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া মানুষ'টির প্রতি। প্রশ্ন জাগে, আসলেই কি মজিদ 'বজ্রকঠিন'। দারিদ্র্য-পীড়িত, শিক্ষা-বঞ্চিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আত্মশক্তিহীন, সাহসহীন, খড়কুটোর মত ভেসে যাওয়া গ্রামের মানুষদের অসহায় অস্তিত্বও আমাদের অস্তিত্বকে আলোড়িত করে। আমরা ভাবি : সাধারণ মানুষ কত দুর্বল! অতি অল্প সংখ্যক লোক বিপুল সংখ্যক লোককে কি বিস্ময়কর রকমে শাসন করে, শোষণ করে, প্রতারণা করে! এক মজিদের অপশক্তির সামনে গ্রামের সকল লোক কত অসহায়! শুধু গ্রামের কথা কেন, শহরের শিক্ষিত লোকদের পরিমণ্ডলেও কি একই দৃশ্য দেখা যায় না? অল্প সংখ্যক লোকের আধিপত্য লিপ্সা বহু লোককে অসহায় করে। এই অসহায় লোকেরা কি শক্তির অধিকার অর্জন করতে পারে না? বিপুল সংখ্যক লোক স্বল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা শাসিত, শোষিত, প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে আত্মশক্তিহীন অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে থাকে কেন? *লালসালু* এই উপলব্ধি আমাদের মনে জাগায়। এ উপন্যাসে এখানেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব।

টীকা

১. আর মজিদের অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা যদি নিতান্তই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম হয় এবং সে জন্যেই যদি সর্বমানুষের বিরুদ্ধে তার এই অকল্যাণকর সিদ্ধান্ত, তবে বর্তমানে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য পীড়িত বিশাল সংখ্যক মানুষ–যাদের অনেকেই নিতান্ত বাঁচার জন্যে ক্রমাগত সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলার আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের কিভাবে বাদ দেবো মজিদের শ্রেণী থেকে। মজিদের স্বীকৃতিতে তারাও কি অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট চরিত্র নয়?

২. মজিদের হৃদয়হীন প্রতিহিংসাপরায়ণতার সূত্রে একটা কথা স্মর্তব্য যে, আর্থিক প্রতিপত্তি লাভ, প্রভূত ক্ষমতা অর্জন আকাঙ্ক্ষা, পরনারীতে গভীর আসক্তি, অন্যকে ঠকানোর কৌশল, পরশ্রমে ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা– আগাগোড়া যার মধ্যে সক্রিয়, আর যা-ই হোক ধর্মের সুবিন্যস্ত জীবনধারার নির্দেশনা তার কাছ থেকে কখনোই আশা করা যায় না। সত্যিকার ঈশ্বর প্রীতির চেয়ে ভণ্ডামীই তার মধ্যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। মজিদও তা-ই, একথা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়।

৩. এখানে এটা উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কাম্যুর *দি প্লেগ* উপন্যাসের নায়ক তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু দ্বিধান্বিত নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ

অতিক্রমণে ভীত নয়। তার চিন্তা ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা নয়, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ। তাই সে স্ত্রীর মৃত্যুতেও ভেঙে পড়ে না কিংবা বিচ্যুত হয় না তার কর্মতৎপরতা থেকে। মজিদ তো এর ঠিক উল্টো। আর জমিলা, নিজ খেয়ালে সম্রাজ্ঞী।

গ্রন্থপঞ্জি

সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৯৮১	*সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা : মিনার্ভা বুকস।
সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৮	*সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
সৌদা আখতার	'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর *লালসালু*', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ২। ঢাকা।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৪৮	*লালসালু*।
১৯৮৬	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী প্রথম খন্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী